

বুদ্ধ তথাগত

BUDDHA TATHAGATA



২৪৯৯

১৯৯৫

অমলেন্দু দাসগুপ্ত



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং

ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

বুদ্ধ তথাগত
BUDDHA TATHAGATA

অমলেন্দু দাসগুপ্ত

পুস্তক প্রকাশ ও প্রাতিস্থান
৫০ টি/১সি, পটারী রোড, কলিকাতা-১৫
দেবী কল্যাণ

প্রাতিস্থান

দিক্‌পাল ভিক্ষু, বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র
৫০টি/১সি, পটারী রোড, কলিকাতা-১৫
DIKPAL BHIKKHU
Vidarshan Sikha Kendra
50T/1C Pottery Road, Calcutta-15

This booklet (BUDDHA TATHAGATA) has
been Published 1000 Copies for free Distribu-
tion for the Welfare of the Buddha Sasana

In Memory of

Late Mrs. HUANG CHIU SHUN JUNG May you
attain the eaternal Peace of Nibbana the highest
blessing of the Buddha hood.

SADHU! SADHU! SADHU!

2539 Buddha Era
1995 AD

Your Loving Husband
HUANG SAM YOU.

Published on Ashari Fullmoon day 1995

ভদন্ত শ্রী অতুলানন্দ স্ববির কৰ্ত্ত্বক প্রথম প্রকাশিত,
দিগ্‌পাল ভিক্ষু কৰ্ত্ত্বক পুনঃ মুদ্রিত ১৯৯৫ ইং

রঞ্জিত কুমার বড়ুয়া ও সুদন্ত বড়ুয়া আধারমানিক,
রাউজান, চট্টগ্রাম।
পুনঃ মুদ্রিত ২০১০ ইং

মুদ্রক-

ওসাকা আর্ট প্রেস

৭, মোমিন রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

SABBADANAM DHAMMADANAM JINATI

(The gift of Dhamma excels all Other gifts)

ধর্মদান সকল দানকে জয় করে ।

বুদ্ধ তথাগত

অমলেন্দু দাসগুপ্ত

পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ দান-বুদ্ধ তথাগত ।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব, ইহার পাঁচশত বছর পরে যীশুর, তারপরও পাঁচশত বছর পরে হজরত মহম্মদের । এক হাজার বৎসরের মধ্যে সমব্যবধানে তিনজন ধর্মগুরু মানবলোকে অবতীর্ণ-বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ তিনটি ধর্ম পৃথিবীর মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত-বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইসলাম । এই তিনটি ধর্মের মধ্যে যদি কোন সাদৃশ্য বা ঐক্য পরিলক্ষিত হয় তবে অগ্রজের নিকটেই কনিষ্ঠের ঋণ স্বীকার্য ।

এই ধর্ম-বিভাগে হিন্দুধর্মকে স্থান দেওয়া হয় নাই তিনটি কারণে । প্রথম হিন্দুধর্মের সর্বজন স্বীকৃত কোন সংজ্ঞা নাই । দ্বিতীয় হিন্দুধর্মের কোন প্রবর্তক নাই । তৃতীয়তঃ হিন্দুধর্ম প্রচারধর্মী ধর্ম নহে । হিন্দুধর্মকে বলা চলে ভারতবর্ষের ঋষির আচরিত ধর্ম বা ঋষিধর্ম । হয়ত এই কারণেই হিন্দুধর্মকে বলা হইয়া থাকে অপৌরুষেয় । বৌদ্ধধর্মের মূলে বুদ্ধ তথাগত, খৃষ্টধর্মের মূলে ত্রাণকর্তা যীশু, ইসলাম ধর্মের মূলে প্রেরিত ‘রসূল’ মহম্মদ । তিনটিই মানব-মূল ধর্ম । কাজেই অ-মূল হিন্দুধর্মকে পৃথিবীর ধর্ম-বিভাগে স্থান দেওয়া হইল না ।

বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইসলাম-এই তিনটির মতবাদে ও আচরণে যত সাদৃশ্য এবং ঐক্যই পরিলক্ষিত হউক না কেন, ইহাদের মূলে মিল নাই । মূলে একটি বিষম বিভেদ বর্তমান । মূল বলিতে বুদ্ধ, যীশু ও মহম্মদকে বুঝিতে হইবে । মহম্মদ একচল্লিশ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ আল্লাহর ‘অহি’ (বাণী) প্রাপ্ত হন এবং নিজেকে প্রেরিত পুরুষ বলিয়া ঘোষণা করেন । ইসলামের আদি উৎস এই খানেই । যীশু ত্রিশ বৎসর বয়সে ঈশ্বরের আহবান শুনিতে পান পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবার

এবং নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করেন। খৃষ্টধর্মের আদি উৎস এইখানেই। উভয় ক্ষেত্রে ইহাকে ধর্মের অলৌকিক আরম্ভ বা আদি দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বুদ্ধের আরম্ভ? মহম্মদকে আহবান করিলেন আল্লা, যীশুকে আহবান করিলেন ‘পরম’ পিতা ঈশ্বর এবং উভয়েই একদিন সহসা সচকিত ও সচেতন হইলেন। বুদ্ধকে কে ডাক দিল? বুদ্ধকে ডাক দিল জগতের দুঃখ। তাঁহার আরম্ভ একেবারে লৌকিক, এই লৌকিক জগতেরই জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক সংক্লেশ এই ছয়টি বিষয় বুদ্ধের মানস লোক বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত করে। ঈশ্বরের আহবানে বুদ্ধ জাগ্রত হন নাই, দুঃখপীড়িত মানব-সমাজ তাঁহাকে জাগাইয়াছে এবং জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদির হাত হইতে মানব-সমাজকে মুক্তি দিবার পথ সন্ধানে তিনি গৃহত্যাগ করেন। মানুষকে দুঃখনিবৃত্তির পথের সন্ধান দিতে হইবে এই চিন্তা ও উদ্দেশ্য লইয়া তিনি বহির্গত হন। ইহা একেবারে লৌকিক প্রয়োজনে। লৌকিক আরম্ভ ঈশ্বরের ‘অহি’ বা আহবান, প্রেরিত পুরুষ বা ত্রাণকর্তা ইত্যাদি অলৌকিক ব্যাপার এখানে কিছু নাই। রোগের প্রতিকার আবিষ্কারের জন্য বৈজ্ঞানিক যেমন সাধনায় মগ্ন হন, এও ঠিক তেমনি। জন্ম, জরা, ব্যাধি ইত্যাদি প্রতিকারের পন্থা আবিষ্কারের জন্য বুদ্ধও তেমনি সাধনায় মগ্ন হন।

খৃষ্টান ও ইসলাম উভয়ের আদি অলৌকিক, কাজেই সংসারের সঙ্গে আদিতে ইহাদের আদৌ কোন যোগ বা সম্বন্ধ নাই। বুদ্ধের আরম্ভ লৌকিক মানুষের, দুঃখেই তাহার আরম্ভ এবং সে দুঃখের নিবৃত্তিতেই তাহার নির্বাণ। এই দৃষ্টিতে একমাত্র বুদ্ধই মানুষ, আর যীশু ঈশ্বরের পুত্র এবং মহম্মদ প্রেরিত পুরুষ। এই দৃষ্টিতে একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মই পৃথিবীতে মানবধর্ম, তাহা প্রেরিত ধর্ম বা স্বর্গরাজ্যের ধর্ম নহে।

মূলের এই বিষম বিভেদ এই তিনটি ধর্মের দীর্ঘ ইতিহাসও স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে আশ্চর্যজনকভাবে অভিব্যক্ত। পৃথিবীর ধর্মের ইতিহাসে প্রধানতম বিস্ময় বোধ হয় ইহাই যে, বুদ্ধের মন্দির আজ পর্যন্ত রক্তে

কলুষিত হয় নাই। ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম-ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্ম, ঈশ্বরের পৃথিবীতে মানুষের সুখ-দুঃখের চেয়ে ঈশ্বরের আদেশই বলবান ও শক্তিমান বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু বৌদ্ধধর্ম? মানুষের দুঃখে যাহার জন্ম, মানুষের দুঃখ-নিবৃত্তিতে যার চরিতার্থতা, প্রচার-পথে সেই মানুষেরই দুঃখবৃদ্ধি কণামাত্র কোন ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় নাই। মানুষের দুঃখকেই যে ধর্মে একমাত্র আসন দেওয়া হইয়াছে তাহার স্বভাব হইতে আদিতে অর্থাৎ জন্মকালে দুঃখ সৃষ্টিকারী আচরণ ও শক্তিটুকু পূর্বাঙ্কেই লোপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বুদ্ধের মন্দিরে মানুষের রক্তের ফোঁটা পর্যন্ত পড়ে নাই, ইতিহাসে এই আশ্চর্য সত্যই সংঘটিত হইয়াছে। ঈশ্বরের ধর্মের চেয়ে মানব ধর্ম, ঈশ্বরের আদেশের চেয়ে লৌকিক ধর্মই ইতিহাসে পরমাশ্চর্য কীর্তি সংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছে।

মূলে যে বিষয় বিভেদ ও পার্থক্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার এমনি আরও একটি বিস্ময়জনক প্রমাণ এই তিনটি ধর্মের ইতিহাসে পরিলক্ষিত হইবে। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, মানুষের ন্যায় প্রত্যেক ধর্মেরও একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব একটি স্বভাব বা স্বধর্ম রহিয়াছে। দ্বিতীয় প্রমাণটি উল্লেখ করিলেই এই সত্য আরও স্পষ্ট হইবে।

ইসলাম ধর্ম যে দেশে প্রচারিত হইয়াছে, সে সকল দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও অধিকার করিয়াছে। ধর্মীয় অভিযান ও সাম্রাজ্য অভিযান প্রায় পাশাপাশি অগ্রসর হইয়াছে। স্বয়ং মহম্মদের জীবনীতে দেখা যাইবে যে, তিনি একাধারে ইসলামের ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রগুরু দুই-ই। খৃষ্টান ধর্মের ইতিহাসও অনুরূপ। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথমে ধর্মযাজক অগ্রসর হইয়াছে, পশ্চাতে অনুসরণ করিয়াছে রাজশক্তি। খৃষ্টান-শক্তির (Christian Power) পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রমাণ

আজিও বিদ্যমান আছে। ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্ম উভয়েরই প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ধর্মকে অপর দেশের রাষ্ট্রশক্তির করায়ত্ত করিবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। ব্যবহারিক জগতে ধর্মের এই ব্যবহার উভয় ধর্মের স্বভাবেই অল্প-বিস্তর পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু বৌদ্ধধর্মের স্বভাবে কি দেখা যায়? বৌদ্ধধর্মের দীর্ঘ ইতিহাস কোথাও ধর্মকে সাম্রাজ্য লাভের উপায় স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। বরং বিপরীত ব্যবহারই পরিদৃষ্ট হয়। ‘দেবানং পিয়’ সম্রাট অশোক তাঁর চিরোজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন, তবে অর্ধেক এশিয়ায় তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারিতেন। ধর্মকে রাজশক্তির প্রয়োজনে তিনি ব্যবহার করেন নাই। বরং অশোক তাঁহার রাজশক্তি লইয়া ধর্মেরই দাসত্ব বা সেবা করিয়াছেন। তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্রাট ‘ধর্মাশোক’ নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইহাকেই ধর্মের স্বভাব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বৌদ্ধ ধর্মের স্বভাবের যে পরিচয় বা প্রমাণ এইখানে দেওয়া গেল, তাহাই পৃথিবীর ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিস্ময়।

একটি প্রশ্ন বহুদিন যাবৎ ঐতিহাসিকগণের নিকট উত্থাপিত রহিয়াছে কি কারণে এবং কেন বৌদ্ধধর্ম এমন প্রসার ও বিস্তার লাভ করিল?

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ঋষিপতন মৃগদাবে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রচার, বুদ্ধ প্রথম প্রচারক এবং পাঁচটি প্রথম শিষ্য। ক্রমে প্রায় সমগ্র ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া উত্তরে তিব্বত এবং চীনের উত্তর মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত অবধি তাহা প্রসারিত হয়। কোরিয়া হইতে জাপান ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে বৌদ্ধধর্ম ক্রমে ক্রমে ছড়াইয়া পড়ে। পূর্বে বর্মা, শ্যাম, দক্ষিণে সিংহল এবং ম্যাদাগাস্কার অবধি এই ধর্মীয় সীমানা বিস্তারিত হয়। পশ্চিমে

আফগানিস্তান, পারস্য, তুর্কিস্থান ও ইহার নিকটবর্তী সমগ্র অঞ্চল বর্তমানে মরুভূমি সিরিয়া, ম্যাসিডোনিয়া এবং অবশেষে মিশরেও বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধধর্মের গৌরবময় অধ্যায়ে ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশই এই মতাবলম্বী হয়, সে দিন পৃথিবীর অর্ধেক মানব-সমাজই বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী হইয়াছিল। অতীতের কথা বাদ দিলেও বর্তমান পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক ধর্মে বৌদ্ধ। কাজেই ঐতিহাসিকের নিকট যদি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে যে, বৌদ্ধধর্মের এ বিস্ময়কর প্রসার ও বিস্তার কি কারণে এবং কেন সম্ভব হইল তবে তাহা আদৌ অযৌক্তিক নহে।

বহু দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক এই প্রশ্নের সম্যক উত্তরের জন্য গবেষণা করিয়াছেন এবং বর্তমানেও অনেক মণীষী এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে চেষ্টিত রহিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্মের অভূতপূর্ব প্রসারের কারণ কি, এই প্রশ্নের একটি উত্তর হইতে পারে-বুদ্ধই বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মূল কারণ। বৌদ্ধধর্ম যে কারণে জন্ম লইয়াছে, এর প্রসারের মূলে সেই কারণটিই অবস্থিত। মানব-সমাজের দুঃখ ও বেদনায় ইহা জাত, সমাজের প্রেমে ইহা প্রকাশিত ও প্রচারিত। যে প্রয়োজনে সিদ্ধার্থ বুদ্ধ ও তথাগত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, ঠিক সেই একই প্রয়োজনে বৌদ্ধধর্ম জনসমাজের প্রিয় ও আপন হইতে পারিয়াছে। কথাটা একটু পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

সমসাময়িক কালের একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক। গান্ধীজীর ভারতব্যাপী প্রভাবের কারণ কি? তাঁহার অহিংসা? তাঁহার সত্যগ্রহ ও সত্য? অর্থাৎ গান্ধীজীর মতবাদই কি তাঁহার দেশব্যাপী প্রভাবের কারণ? ইহার উত্তরে প্রথমেই এবং অনায়াসেই বলিতে হয় যে, না, ইহা ঠিক না, ইহা ঠিক কথা নহে। অহিংসা ও সত্য ভারতবর্ষে নূতন নহে এবং 'অহিংসা' দেশ পুরাপুরি গ্রহণও করে নাই। সুতরাং প্রশ্নের উত্তর অন্যত্র অব্বেষণ করিতে হইবে। প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর আছে তাহা এই-

গান্ধীজীকেই দেশ গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহার মতবাদকে নহে ; গান্ধীজীকে দেশ গ্রহণ করিয়াছে তাই তাঁহার মতবাদ ও নীতিকে স্থান দিতে, সম্মেহে বা শ্রদ্ধায় প্রশ্রয় দিতে জাতির দ্বিধা হয় নাই । মানুষের মতবাদ নয়, মানুষটিকেই গ্রহণযোগ্য বা গৃহীত হইয়া থাকে । মতবাদ দ্বারা আকৃষ্ট যাহা হয়, তাহা মানুষ নয়, মানুষের বুদ্ধি । এই বুদ্ধি জনসাধারণের সাধারণ সম্পত্তি নহে, ইহা অসাধারণ ক্ষেত্রে অল্প কতিপয়েরই থাকে । গান্ধীজীর অহিংসা, সত্য ইত্যাদিতে যে মতবাদ ব্যক্ত তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনাই এই বুদ্ধির মহল হইতে প্রভূত পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে । অথচ ঐ বুদ্ধির মহলের মানুষগুলি গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আত্মীয়তা জানাইতে বাধ্য হইয়াছে । সুতরাং এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হইতে বাধ্য যে, গান্ধীজীর প্রভাব ও প্রতিপত্তির মূলে তাঁহার মতবাদ নহে ; তিনি স্বয়ং নিজে । অর্থাৎ মানুষের মতবাদ নহে, মানুষই গ্রহণযোগ্য বা গ্রহীতা হইতে পারে ।

বৌদ্ধধর্ম প্রসারের মূলে বৌদ্ধ মতবাদ দর্শন, নীতি, শীল, বিনয় ইত্যাদি কোন কিছু নহে, ইহা প্রসারের মূল স্বয়ং বুদ্ধ । বুদ্ধের মতবাদ তাঁহার চারিটি আর্থসত্য, তাঁহার আর্থ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, এক কথায় বৌদ্ধধর্মের যাবতীয় কিছুকে অস্বীকার ও নস্যাৎ করা যাইতে পারে কিন্তু বুদ্ধকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই, বুদ্ধ স্বীকার করিতেই হয় । মতবাদকে অস্বীকার করিতে বুদ্ধিই যথেষ্ট কিন্তু বুদ্ধকে অস্বীকার করিতে হইলে বুদ্ধোত্তর চরিত্রের প্রয়োজন । সে চরিত্র বা তেমন মানুষ অদ্যাপি ইতিহাসে আসে নাই ।

বুদ্ধ নামে যে মানসিক মূর্তি আমাদের চেতনায় আকার গ্রহণ করে, তাহা আলোক, জ্ঞান, সম্বোধিতে গঠিত মূর্তি । কিন্তু এই বাহ্য, আরও একটু আগে যাইতে হইবে । নিখিল জগতের দুঃখ যাহাকে জন্ম দিয়াছে, সেই নিখিল জগতের নিকট তিনি ‘জ্ঞান’, ‘সম্বোধি’রূপে ফিরিয়া আসিলেও সঙ্গে আনিয়াছেন অমৃতম্-মহাপ্রেম । এই মহাপ্রেমই-

‘মহাকরুণা’ ও ‘মহামৈত্রী’ হইয়া দুঃখের জগতে বুদ্ধমূর্তিতেই ধরা দিয়াছে। এই কারণেই ঋষি কবি বুদ্ধকে নমস্কার জানাইয়াছেন- ‘করুণাঘন’ নামে ডাকিয়া। মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করা যায় কিন্তু বুদ্ধকে, মহামিত্রকে, মহাকারুণিককে প্রত্যাখ্যান করার শক্তি মানুষের বা মানব-সমাজের নাই। মানুষের চরম বেদনায় মানুষ যাঁহাকে ডাক দিল, মানুষ তাঁহাকেই ফিরাইয়া দিবে, এ অসম্ভব অদ্যাপি সম্ভব হয় নাই।

বুদ্ধের ব্যক্তিত্ব বলিয়া যদি কিছু থাকিয়া থাকে তবে মৈত্রী ও করুণাই তাহা জমাট-মূর্তি। বৌদ্ধধর্ম প্রসারের মূলে বৌদ্ধধর্ম নহে, তাহার মূলে ‘মহামিত্র’ ও মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধ।

বৃহদারণ্যকের ঋষির একটি উপদেশ-‘সুর-শব্দ গ্রহণ করিও না, বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ কর। কথা গ্রহণ করিও না, বক্তাকে গ্রহণ কর।’ কারণ যন্ত্র গ্রহণ করিলে তার সঙ্গে সমস্ত সুর-শব্দ জগতকেই গ্রহণ করা হয়, বক্তা গ্রহণ করিলেই যাবতীয় বক্তব্যকে গ্রহণ করা হয়। তেমনি বুদ্ধকে গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের যাবতীয় কিছুই গ্রহণ করা হয়। বুদ্ধকে বাদ দিয়া প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মের কিছু গৃহীত হয় না।

কিন্তু বুদ্ধ তথাগতের পরিনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই তো বুদ্ধ গ্রহণ ও অগ্রহণের সীমানার বাহিরে গিয়াছেন? তাঁহার পরিনির্বাণের পরেই তো বৌদ্ধধর্ম ক্ষয়ের অভিমুখে যাইবার কথা? তাহা না হইয়া তাঁহার পরিনির্বাণের পরেই তো বৌদ্ধধর্ম প্রসার ও বিস্তারলাভ করিয়াছে? ইহা কেন এবং কি কারণে সম্ভব হইলে? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর এখনও সম্পূর্ণভাবে দেওয়া হয় নাই।

সূর্য অস্তমিত হয় কিন্তু ধরণীর বুকে লতায়-পাতায় গুল্মে এবং তার মাটিরে সে আলো ধরিয়া রাখে। আকাশচারী মেঘ বারিবর্ষণ করিয়া চলিয়া যায়, পৃথিবী তার নদী, তড়াগ, পুকুর-খেত-খামার এবং অবশেষ নিজের মাটির ঘরের গোপন ভাণ্ডে সে রসবর্ষণ সঞ্চয় করিয়া রাখে। আর মেঘের সঞ্চিওত সলিল-সম্পদটুকুই ধরিত্রী হিমগিরিশিখরে তুষারের

ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখে । বুদ্ধের মতবাদ সুত্রপিটক, অভিধম্মপিটক ও বিনয়পিটক এই ত্রিপিটকের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া আছে । আর বুদ্ধ? বুদ্ধকে ধরিয়া রাখিয়াছেন বুদ্ধ শিষ্যগণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের পাত্রটিতে ।

হিমালয়ের মাথায় তুষারের ঘরে বন্যা জমাট বাঁধা, তেমনি ভারতব্যাপী সংঘারামে বুদ্ধকে ধরিয়া রাখা হইয়াছি । মৈত্রী, করুণা, মুদিতা-উপেক্ষার সাধনাগার এই সংঘারাম । এই সাধনায় বা কৌশল ভিক্ষু, শ্রমণ শ্রাবকগণ নিজ নিজ চরিত্রের পাত্র স্বশক্তিমত ভরিয়া লইয়া দেশ-দেশান্তরে বহির্গত হইত । বুদ্ধকে যে যতটা এইভাবে নিজের মধ্যে বহনও ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি দুঃখের জগতে মানুষের সমাজে সেই অনুপাতেই পরমাত্মীয় বলিয়া আদৃত ও স্বীকৃত হইয়াছেন । বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান সম্ভব নহে বলিয়াই ইহাদিগকে প্রত্যাখ্যান সম্ভব হয় নাই । কেন সম্ভব হয় না পূর্বেই ব্যক্ত হইয়াছে । বৌদ্ধধর্মে সাধনায় নহে, বুদ্ধ-সাধনায় ইহারা যে কতটা সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি ততটা বুদ্ধ হইয়াছেন । সংঘারাম হইতে দলে দল শতাব্দীর পর শতাব্দী ছোট বড়, ক্ষুদ্র বৃহৎ বুদ্ধের শিষ্যের দল পৃথিবীতে বাহির হইয়াছে । বৌদ্ধ সংঘারামগুলি বুদ্ধ প্রস্তুত করিবার সাধনাগার । সুতরাং এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ তিনটি মহাদেশে বৌদ্ধধর্মের অভূতপূর্ব প্রসার ও বিস্তৃতির মূলে স্বয়ং বুদ্ধ অর্থাৎ ভারতবর্ষের সংঘারাম ।

মানব সভ্যতায় ও সমাজে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের স্থান কি কতখানি তাহা সম্রাট ধর্মাশোকের ইতিহাসটুকু পাঠ করিলেই একটা ধারণা আমরা পাইতে পারি । ঐতিহাসিকদের উপর সে দায়িত্ব ন্যস্ত থাকুক অনাধিকার চর্চা হইতে বিরত রহিলাম । শুধু সাধারণভাবে মানুষের দৃষ্টি লইয়া দুই একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে ।

সাম্য (Equality) বলিয়া কথাটি বর্তমান যুগে একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করিয়াছে । রাষ্ট্রকে এই সাম্যের ভিত্তিকে গঠন ও প্রতিষ্ঠা করিবার

চেষ্টা বর্তমান সভ্যতার বিশেষ একটি অধ্যায়। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে সম্রাট অশোক পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, শুধু সাম্য নহে তাহার চেয়ে মহত্তর নৈতিক ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন প্রকৃতই সম্ভব। যেমনি গান্ধীজী পরীক্ষা করাইয়া দেখাইয়া গেলেন যে, অহিংসার পথেও চল্লিশ কোটি মানুষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব। ভারতবর্ষের সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রী ও অপরাপর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে বৌদ্ধ ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাস পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ভারতবর্ষের ইতিহাসই তাঁহাদিগকে বলিয়া দিবে যে, বর্তমান সভ্যতা সোভিয়েট রাশিয়ায় যে পরীক্ষায় আজ ব্যাপ্ত এবং যে পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই তাহার চেয়েও মহত্তর ভিত্তিতে ও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং তাহা সার্থক হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও তাহার সাধনার সিদ্ধি উপেক্ষা করিয়া নূতন ভারতবর্ষ রচনার স্বপ্ন যাঁহারা দেখেন, নিজের চুলের মুঠি ধরিয়া নিজেকে শূণ্যে উত্তোলনের ব্যর্থ চেষ্টা তাঁহারা করিতেছেন।

‘সাম্য’ ইসলামের দান বলিয়া একটি বিশেষ মতবাদ প্রচলিত আছে। ইসলাম ধর্মে উচ্চ নীচ, বাদশা-প্রজা ইত্যাদি কোন ভেদ নাই। কথটা সত্য কিন্তু এই সামাজিক সাম্য ইসলামের বিশেষ দান নহে। এই দানের জন্য মানব ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের নিকট ঋণী! ইসলামের আবির্ভাবের হাজার বৎসর পূর্বে বৌদ্ধ-ভারতের এই সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ-প্রথা উচ্ছেদও লোপ করা হইয়াছিল।

সাম্যের সঙ্গে গণতন্ত্র (Democracy) অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গণতন্ত্রও ইসলামের দান বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে। ইহা ঠিক নহে। বৌদ্ধধর্মে সাম্যের সঙ্গে গণতন্ত্রও পূর্ণভাবে গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ সংঘারামসমূহের গণতন্ত্র অনুধাবন করিলে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীতে গণতন্ত্র এখানেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভ্রাতৃত্ব (Brotherhood) ইসলামের ও খৃষ্টান ধর্মের একটি বৃহৎ সম্পদ । বিশেষভাবে ইসলাম ধর্মের দান ভ্রাতৃত্ব এই মতবাদ মুসলমানদের মধ্যে বন্ধমূল দেখা যায় । এই মতবাদ ইতিহাসে সমর্থিত হয় না । ইসলামের ভ্রাতৃত্ব মুসলমান সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; তাহার অধিক ইহা অগ্রসর হইতে পারে নাই । ইহারও এক হাজার বৎসর পূর্বে ভ্রাতৃত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া ‘বিশ্বমৈত্রী’ আদর্শে বৌদ্ধধর্ম বিশ্বের সকলকে আত্মীয়তায় গ্রথিত করিয়াছিল । পশুজগত পর্যন্ত এই মৈত্রী বন্ধন হইতে উপেক্ষায় অস্পৃশ্য হইয়া থাকে নাই ।

বর্তমান পৃথিবী জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বশান্তির পরীক্ষায় ও প্রচেষ্টায় ব্যাপ্ত । কিন্তু মূলসূত্রটি আজও বৈজ্ঞানিক সভ্যতার অনায়ত্ত রহিয়াছে । আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের বুদ্ধ ‘মহামৈত্রী’ সম্পদটি পৃথিবীর ভাঙারে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, ‘বৈর দ্বারা বৈর প্রশমিত হয় না, মৈত্রীই তাহা প্রশমনের পন্থা, শান্তির অন্য পথ নাই । পৃথিবীর দুঃখ দূর করিবার অথবা পৃথিবীতে মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার একটি মাত্র পথই আছে এবং তাহাই-বুদ্ধ পন্থা মহামৈত্রী । এই আড়াই হাজার বছরের মধ্যে নূতনতর পথের সন্ধান আজ পর্যন্ত কেহই দিতে পারেন নাই ।

মহর্ষি যজ্ঞবল্ক্য একদা কপিলদেবকে ‘নিখিল-ভাস্বর জ্যোতি কপিল মহাতাপস’ বলিয়া দুই বাহু বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন । ঋষি যজ্ঞবল্ক্যর সামান্য একটু পরিবর্তন করিয়া বুদ্ধচরণে আমরা প্রণাম জানাই-“নিখিল-ভাস্বর জ্যোতি গৌতম মহাকারুণিক ।”

নমো সম্মুখায়

স্বামী বিবেকানন্দ

১

বুদ্ধ আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর ।

তিনি এসেছিলেন আমার ঘরে, জীবনে আমার, একেবারে বাল্যকালে ।

তখন স্কুলে পড়ি, ধ্যান করছি রুদ্ধ ঘরে,

অকস্মাৎ আবির্ভূত জ্যোতির্ময় পুরুষ, সম্মুখে ;

মুখে অপূর্ব আলোক, মুণ্ডিত, মস্তক দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে প্রশান্ত সন্ন্যাসী,

ভাষাময় নয়নে তাকিয়ে আমার দিকে, যেন কিছু বলবেন ।

অভিভূত আমি, প্রণাম করেছি সাষ্টাঙ্গে, কিন্তু ভয় পেয়েছি,

দ্বার খুলে বেরিয়ে এসেছি নির্বোধের মতো,

শোনা হয়নি তাঁর কথা ।

জানি তবু জানি-প্রভু বুদ্ধই এসেছিলেন আমার কাছে ।

তারপর একদিন বুদ্ধগয়ায় ধ্যানে বসেছি বোধিবৃক্ষতলে,

আর শিউরে উঠেছি-এও কি সম্ভব ।-

যে-বায়ুতে নিশ্বাস নিয়েছিলেন তিনি-

তাতেই শ্বাস নিচ্ছি আমি ।

যে-মাটিতে বিচরণ করেছিলেন-

তাতেই অবস্থিত আমিও!

বুদ্ধ ।

তিনি সেই একমাত্র যাঁতে আবির্ভূত এবং বিঘোষিত এই বার্তা-

‘মৃত্যু মহা অভিশাপ-অভিশাপ এ-জীবন ।

মৃত্যু ও জীবনের লয় যে-নির্বাণে-

তাই হোক মানবের শ্রব আশ্রয় ।’

ওঁ নমো ভগবতে সম্বুদ্ধায় ।

২

জগৎ দেখেনি তার মতো সংস্কারক

যিনি বলেছেন স্থির কঠে :

কিছু শুনেছ বলেই তাকে বিশ্বাস করো না;

বংশানুক্রমে কোনো মত পেয়েছ বলেই তাকে বিশ্বাস করো না;

প্রাচীন কোনো ঋষির বাক্য বলেই তাকে বিশ্বাস করো না;

বিচার করো, বিশ্লেষণ করো, দ্যাখো যুক্তির সঙ্গে মেলে কিনা ;

দ্যাখো তা সকলের কল্যাণকর কিনা,

যদি হয়, তবেই গ্রহণ করো,

আর জীবন যাপন করো সেই মতো ।

তार्কিক ব্রাহ্মণকে বুদ্ধ প্রশ্ন করলেন-

আপনারা ব্রহ্মকে দেখেছেন?

-না ।

আপনাদের পিতা ব্রহ্মকে দেখেছেন?

-মনে হয় না ।

আপনাদের পিতামহ ব্রহ্মকে দেখেছেন?

-জানি না ।

হে বন্ধুগণ । যাকে না দেখেছেন আপনি,

না দেখেছেন আপনার পিতা বা পিতামহ,

সেই অদৃশ্যের দ্বারা দাবিয়ে রাখতে চান অন্যদের-

কি আশ্চর্য!

ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যে চলেছে তুমুল তর্ক,

কোলাহল, বিষাক্ত বাক্য-বিনিময় ।

বুদ্ধ শান্তভাবে সব শুনলেন, পরে বললেন,

আপনাদের শাস্ত্র কি বলেছে-ঈশ্বর ক্রোধী?

-না বলেনি ।

আপনাদের শাস্ত্র কি বলেছে-ঈশ্বর অপবিত্র?

-না, অবশ্যই বলেনি ।

আপনাদের শাস্ত্র এ-বিষয়ে কী বলেছে?

-শাস্ত্র বলেছে-ঈশ্বর পবিত্র, ঈশ্বর প্রেমময়, ঈশ্বর মঙ্গলময় ।

স্নিগ্ধ হাসিতে বুদ্ধ বললেন, হে বন্ধুগণ!-

তাহলে কেন আপনারা চেষ্টা করেন না পবিত্র ও মঙ্গলময় হতে-

যাতে ঈশ্বরকে জানতে পারেন?

ধর্মে অলৌকিকতার প্রচণ্ড বিরোধী বুদ্ধের কাছে শিষ্যরা সোৎসাহসে বললেন-

এক অলৌকিক ক্রিয়াকারীর কথা ।

সে লোকটি নাকি শূন্য থেকে মৃৎভাণ্ড নামাতে পারে ।

তেমন একটি পাত্র বুদ্ধকে দেখানোও হল ।

লাথি মেরে সেটি ভেঙে বুদ্ধ বললেন-

কদাপি অলৌকিকতার উপরে ধর্মকে দাঁড় করাবে না ।

অনুসন্ধান করো বিশুদ্ধ সত্যের,

অগ্রসর হও আত্মজ্যোতির আলোকে ।

সত্যের জন্য বুদ্ধের নির্ভয় সন্ধান,

প্রতিটি প্রাণীর জন্য অপূর্ব, প্রেম,

জগতে অনন্য ।

ধর্মজগতের মহাসেনাপতি বুদ্ধ,

সিংহাসন অধিকার করেছিলেন

অপরকে দান করার জন্যই ।

৩

বুদ্ধ প্রেরণ করতেন প্রেমপ্রবাহ-

উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে, উর্ধ্বে ও নিম্নে-

যতক্ষণ না পূর্ণ হয়ে যায় সমগ্র জগৎ সে অনন্ত স্রোতে ।

সম্মুখে রয়েছে আলোকিত বিশ্বজগৎ,

এ বিশ্বের সবকিছু আমাদের,

বাহু প্রসারিত করে আলিঙ্গন করো জগৎকে ।

মহারণ্যে বুদ্ধের ধ্যান আত্মমুক্তির জন্য নয় ।

জগৎ জ্বলছে-নির্গমনের পথ চাই-

বাঁচার জন্য ।

জগতে এত দুঃখ কেন-কেন

সেই যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত তিনি ।

অনুসরণ করো তাঁকে-বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে যিনি

পাঁচশতবার জন্মেছেন ও মৃত্যুবরণ করেছেন-

সেই শ্রীবুদ্ধকে ।

৪

বুদ্ধের ধর্ম দ্রুত ছড়িয়েছিল তাঁর দর্শনের জন্য নয়,

বুদ্ধের বিস্তারের কারণ তাঁর অপূর্ব প্রেম ।

মানব-ইতিহাসে সেই প্রথম একটি বিশাল হৃদয় করুণায় বিগলিত,

সিঁক্ত করেছিল সর্বপ্রাণীকে ।

ঈশ্বরকে ভালবেসেছে মানুষ কিন্তু ভুলেছে মনুষ্য-ভ্রাতাকে ।

ঈশ্বরের জন্য প্রাণ দিয়েছে সে-নিয়েছৈও প্রাণ-

ঈশ্বরেরই নামে ।

বলি দিয়েছে নিজ সন্তানকে, লুণ্ঠন করেছে অন্য দেশ ও জাতিকে,

খুন করেছে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে,

সিঁক্ত করেছে ধরিত্রী রক্তে শুধু রক্তে,

সবই ঈশ্বরের নামে-ঈশ্বরেরই নামে ।

বুদ্ধের শিক্ষাতে মানুষ প্রথম মুখ ফেরাল অপর ঈশ্বরের দিকে,

সে ঈশ্বর-মানুষ ।

বুদ্ধের ভিতর থেকে উঠেছিল বিশুদ্ধ প্রেম আর জ্ঞানের ঢেউ,
তা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেশের পর দেশ,
পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ-সর্বদিক-সর্ব প্রান্ত ।
অসাম্যের বিরুদ্ধে চির সংগ্রামী,
জাতিভেদ খণ্ডনকারী,
অধিকারবাদ নাশকারী,
সর্বপ্রাণীর সাম্যবিঘোষক,
লক্ষ লক্ষ পদদলিতের পরিত্রাতা-
তিনি তথাগত-বুদ্ধ ।

৫

বুদ্ধের এই দারুণ বার্তা ;
উন্মূল করো নিজ হৃদয়ের স্বার্থপরতা,
উন্মূল করো সকলই যা স্বার্থে ভোলায় মানুষকে ।
স্ত্রী নয়-পুত্র নয়-পরিবার নয়-না-না
আবদ্ধ হয়ো না সংসারে ।
স্বার্থশূন্য হও! স্বার্থশূন্য হও!
অতন্দ্র বুদ্ধের বাণী :
তীব্রগতি কাল, নশ্বর জগৎ, দুঃখ সর্বস্ব যেখানে ।
তোমার ঐ উত্তম খানা, সুন্দর বসন, আরামের আবাস!
হে মোহনিদ্রিত নর-নারী-
ভেবেছ কি কোটি-কোটি ক্ষুধাতুরের কথা যারা মৃত্যুপথযাত্রী
শুধু দুঃখ, শুধু দুঃখ-ভুলোনা এই মহাসত্য ।
জগতে প্রবেশের মুখে শিশু কাঁধে,
সেই তার প্রথম উচ্চারণ ।
কান্নাই সত্য জগতে-সকলে কাঁদছে-কাঁদবে ।
এই জেনে ত্যাগ করো স্বার্থ ।

আচার্যদের মধ্যে বুদ্ধই সর্বাধিক শিখিয়েছেন
আত্মবিশ্বাসী হতে ।

যেখানে স্বাধীনতা সেখানেই শান্তি-তিনি বলেছেন ।

যেখানে অধীনতা সেখানেই দুঃখ-তিনি বলেছেন ।

মানুষে রয়েছে অনন্ত শক্তি,

কেন সে কেবলই প্রার্থনা করবে ঈশ্বরের কাছে?

প্রতি স্বাসে উপাসনা করছ তোমরা-একথা ভুলো না ।

আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি-এও উপাসনা ।

তোমরা শুনছ-এও উপাসনা ।

শরীর-মনের এমন মুহূর্ত কি সম্ভব যখন মানুষ

দিব্যশক্তিই প্রকাশলীলার অংশী নয়?

প্রার্থনা কি যাদুমন্ত্র যে শব্দোচ্ছারণেই অলৌকিক ফল লাভ?

না-না-প্রত্যেককে শ্রমে ও ধর্মে পৌঁছতে হবে গভীরে,

অনন্ত শক্তির উৎস

শ্রমই সর্বোচ্চ প্রার্থনা-বাক্য নয় ।

কর্মের দ্বারা উপাসনা করো-নীরবে ।

প্রলোভন এসেছিল বুদ্ধের কাছে, হাতছানি দিয়ে বলেছিল,

ছেড়ে দাও সত্যের সন্ধান,

ফিরে যাও সংসারে, পুরনো জীবনে, জুয়াচুরি আর মিথ্যার জগতে,

ভ্রান্ত শব্দে চিহ্নিত করো সদ্বস্তুকে ।

প্রলোভনের ধ্বংসস্বপ্নে দাঁড়িয়ে সেই মহাকায় পুরুষ বলেছিলেন,

সত্যের সন্ধানে মৃত্যুও শ্রেয়-অজ্ঞানের জীবনের চেয়ে ।

যুদ্ধক্ষেত্রে বিনাশও শ্রেয়-পরাজিত জীবনের চেয়ে ।

শত্রু বা মিত্র, কেউ কখনো বলতে পারেনি

সর্বজনের হিত ছাড়া বুদ্ধ একটি নিশ্বাসও নিয়েছেন,

একটুকরো রুটিও খেয়েছেন ।

কল্যাণের জন্যই তিনি কল্যাণকৃৎ ।

প্রেমের জন্যই তিনি প্রেমিক ।

বুদ্ধের শিষ্যরা প্রশ্ন করলেন-আমরা সৎ হব কেন?
 বুদ্ধ বললেন-তোমরা সদ্ভাব পেয়েছ উত্তরাধিকারসূত্রে,
 সদ্ভাবের উত্তরাধিকার রেখে যাও পরবর্তীদের জন্য ।
 এসো আমরা চেষ্টা করি সমষ্টিগত সাধুতার বৃদ্ধির জন্য,
 এসো আমরা সদাচরণ করি সদাচরণের জন্যই ।
 মানুষের দুঃখের জন্য মানুষই দায়ী,
 মানুষের সদাচরণের প্রশংসা মানুষই পাবে ।
 সমুদ্রের ঢেউ নেমে যাবার সময়ে সঞ্চারিত করে যায়
 পরবর্তী ঢেউয়ে উত্থানের শক্তি,
 তেমনি এক আত্মা দিয়ে যায় নিজের শক্তি-
 ভবিষ্যৎ আত্মায় ।

৬

হে পাশ্চাত্যবাসীগণ! তোমরা বলছ-
 ক্রুশবিদ্ধ হলে বৃদ্ধি পেত বুদ্ধের মহিমা ।
 হায়-ঠিক!
 রোমক নিষ্ঠুরতার হে পূজারীগণ!
 তোমরা কেবলই চাও অসাধারণ কাণ্ড, এপিক গর্জন,
 'হেঁটমুণ্ডে অতলস্পর্শে গহ্বরে নিষ্ক্ষেপের'
 মিল্টনী চীৎকার!
 খ্রীষ্টকে পেরেক ঠুকে মারা হয়েছে, তিনি ককিয়ে কেঁদেছেন,
 খুবই পছন্দ তোমাদের ।
 জীবনের সামান্য ঘটনার কবিত্ব তুচ্ছ তোমাদের কাছে,
 আমাদের কাছে কিন্তু নয় ।
 অপূর্ব লাগে বুদ্ধের জীবনের ছোটখাটো ঘটনাগুলি ।
 যেমন ধরো না কেন-
 মৃতপুত্র বুকে নিয়ে মা এসেছে কাঁদতে-কাঁদতে-
 'হে বুদ্ধ! হে প্রভু! জীবন দান করো পুত্রের,
 সকলই সাধ্য তোমার ।'

বুদ্ধ বললেন করুণা-কণ্ঠে,

‘মাতঃ! প্রাণভিক্ষা করছ পুত্রের?’

তার আগে ভিক্ষা করে আনো এক মুঠো শ্বেত সরিষা,
এমন গৃহ থেকে যেখানে প্রবেশ করেনি মৃত্যু।’

‘শুধু এই? এত সামান্য? এখনই আনছি-’

ছুটে বেরিয়ে গেল জননী, সারাদিন ঘুরল দ্বারে-দ্বারে,
কিন্তু পেল না, কারণ মৃত্যু নেই এমন গৃহ নেই।

মৃত্যুস্রোতের কূলে দাঁড়িয়ে পুত্রহারা মা জেনেছিল-
জীবনের অনিবার্য সত্য-

মৃত্যু।

আরও কাহিনী-

বুদ্ধ কাঁধে তুলে নিয়েছেন ছাগশিশুটিকে।

ছাগশিশু খুঁড়িয়ে হাঁটছিল যুপকাঠের দিকে-

বলির পশুদের সঙ্গে।

বুদ্ধ এসে দাঁড়ালেন রাজদ্বারে,

পুণ্যলোভাতুর নৃপতিকে বললেন,

হে মহারাজ! ছাগশিশুকে বলি দিলে যে পুণ্য

তারো চেয়ে বহুগুণ পুণ্য পাবে মানুষকে বলি দিলে।

আমি প্রস্তুত-ছাগশিশুর স্থান নিতে।

হেলায় রাজসম্পদ ত্যাগ করে বুদ্ধ নেমেছেন পথে-

এর নাটকীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ তোমরা ; হে পাশ্চাত্যবাসী!

ওটা কোনো বিরাট ব্যাপার নয় ভারতবর্ষে।

এক ক্ষুদ্র রাজার পুত্র গৌতম, কি-বা ঐশ্বর্য তাঁদের,

তাঁর মতো ত্যাগ অনেকেই করেছেন পূর্বে।

কিন্তু কোনো তুলনা নেই নির্বাণ পূর্ববর্তী ঘটনার,

সহজের অপূর্ব সৌন্দর্যে পূর্ণ সেগুলি-

রাত্রি গভীর, বৃষ্টি ঝরছে অবিরাম।

বুদ্ধ দাঁড়ালেন এসে এক গোপের কুটীরে,

হাঁচের নীচে দেওয়ালের গা ঘেঁষে।

ছাঁচ দিয়ে জল ঝরছে । বাতাসের ঝাপটা
জানলা দিয়ে গোপ চকিতে দেখল সন্ধ্যাসীকে ।
'বা! বা! গেরুয়াধারী যে! থাকো ওখানে ।
ওই তোমার ঠিক জায়গা ।'

গান ধরল সে-

গোরু-বাছুর উঠেছে গোয়ালে, আগুনে তপ্ত ঘর,
নিরাপদ পত্নী আমার, সুখে নিদ্রিত সন্তানেরা,
সুতরাং মেঘগণ! আজ রাত্রে-
তোমরা বর্ষণ করো স্বচ্ছন্দে ।'

বুদ্ধ উত্তর দিলেন-

'আমার মন সংযত, ইন্দ্রিয় প্রত্যাহত,
হৃদয় দৃঢ় ও সুস্থির ।

সুতরাং হে মেঘগণ! আজ রাত্রে-
তোমরা বর্ষণ করো স্বচ্ছন্দে ।'

গোপ গাইল-

'খেতের ফসল কাটা শেষ, খড় উঠেছে খামারে,
জলভরা নদী, মজবুত বাঁধানো পথ,
সুতরাং হে মেঘগণ! আজ রাত্রে-
তোমরা বর্ষণ করো স্বচ্ছন্দে ।'

গাইতে-গাইতে-লাগল গোপ,
উত্তর দিয়ে গেলেন বুদ্ধ একই ভাবে ।

ক্রমে নম্র হয়ে এল গোপের কণ্ঠ,
নত হল সে বুদ্ধের চরণে,.....

অনুতপ্ত হৃদয়ে-শিষ্যত্বের জন্য ।

মৃত্যুতে মহীয়ান বুদ্ধ-জীবনের মতোই ।

অন্ত্যজ জাতির এক মানুষ আহাৰ্য দিল তাঁকে,

দুষ্ট উপাদানে, অশুচি পরিবেশে প্রস্তুত খাদ্য ।

বুদ্ধ শিষ্যদের বললেন, তোমরা খেয়ো না এ জিনিস,

কিন্তু আমি তো পারব না প্রত্যাখ্যান করতে ।

যাও, বলে এসো ঐ মানুষটিকে,
 আমার সর্বোচ্চ সেবা সে করেছে,
 আমাকে মুক্ত করেছে এই দেহের বন্ধন থেকে ।
 বুদ্ধ বিদায় নেবেন পৃথিবী থেকে,
 বৃক্ষতলে বিছানো চীর,
 সিংহের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ান আনন্দময় পুরুষ,
 মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ।
 প্রিয় শিষ্য আনন্দ কাঁদছিলেন ।
 বুদ্ধ তিরস্কার করে বললেন,
 জেনে রাখো, বুদ্ধ ব্যক্তি বিশেষ নন,
 ওটি এক উচ্চ অবস্থা, যে-কেউ লাভ করতে পারে ।
 অন্য কাউকে অর্চনা নয়-
 অন্তর্দীপো ভব ।
 সিংহ যেমন ভীত নয় শব্দে,
 জালবদ্ধ নয় বায়ু, জললিগু নয় পদ্মপত্র,
 তেমনি একাকী বিচরণ করো গগারের মতো ।
 দৃষ্টি দিও না পথের দিকে, গ্রাহ্য করো না কোনোকিছু,
 অগ্রসর হও গগারের মতো একাকী ।
 শেষ মূহূর্ত ঘনিয়ে আসছে তথাগতের,
 সকলে নীরব, রুদ্ধশ্বাস!
 দূরাগত একজন সহসা ছুটে এল সেখানে,
 উপদেশপ্রার্থী ।
 হবে না, সম্ভব নয়-শিষ্যরা ফেরালো তাকে ।
 বুদ্ধ থামালেন ।
 বুদ্ধ বললেন, ওকে আসতে দাও,
 তথাগত সর্বদা প্রস্তুত ।
 সঙ্কলক : শঙ্করীপ্রসাদ বসু ।

এ প্রবন্ধের লেখক আনন্দবাজার পত্রিকার
সহকারী সম্পাদক অমলেন্দু দাশগুপ্ত সম্প্রতি
পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি
'জগজ্জ্যোতি'র অন্যতম বিশিষ্ট লেখক ও
হিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৪৯ ইংরেজীর ১৪ই
জানুয়ারী বুদ্ধের প্রধান শিষ্য সারিপুত্র ও
মৌদগল্লায়ণের পুতাস্থি ভারতের প্রধানমন্ত্রী
শ্রীনেহেরু কর্তৃক ভারতীয় মহাবোধি
সোসাইটির তদানীন্তন সভাপতি ডক্টর
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হস্তে
আনুষ্ঠানিকভাবে অর্পন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত
উৎসব দিবসে প্রকাশিত দৈনিক আনন্দবাজার
পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা হইতে ইহা সংগৃহীত
এবং জগজ্জ্যোতিঃ নব পর্য্যায় ষষ্ঠ-বর্ষ-
আশ্বিনী-পূর্ণিমা সংখ্যায় পুনঃ প্রকাশিত।